মি অ্যান্ড দ্যা মস্ক

আমার মসজিদ আমার অধিকার

জারকা নেওয়াজ

মি অ্যান্ড দ্যা মস্ক

আমার মসজিদ আমার অধিকার

মি অ্যান্ড দ্যা মস্ক

আমার মসজিদ আমার অধিকার

জারকা নেওয়াজ

অনুবাদ
মাসউদুল আলম

অনুবাদ সম্পাদনা
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
CSCS

মি অ্যান্ড দ্যা মস্ক: আমার মসজিদ আমার অধিকার

জারকা নেওয়াজ | অনুবাদ: মাসউদুল আলম

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক
সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
কার্যালয় (অস্থায়ী):
এসই— ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১।
☏ ০১৯৫৩ ৩২৩০৩০
✉ connectcscs@gmail.com
Ø cscsbd.com

অনুবাদ স্বত্ব
সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

মূল্য
১০০ টাকা মাত্র

'Me and the Mosque: Amar Masjid Amar Odhikar' by Zarqa Nawaz, translated by Masudul Alam, published in April 2021 by CSCS Publications, South Campus, University of Chittagong. BDT 100 only.

পরিচালকের কথা

নারী অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামপন্থীদের কথাবার্তা হলো 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই' প্রবাদের মতো। মহানবীর (সা.) সময়কালে মসজিদে নববীতে নারীরা পুরুষদের পেছনে নামায আদায় করতেন। অথচ বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব জুড়ে নারীদের মসজিদে প্রবেশ রীতিমতো নিষিদ্ধ। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ধরনের সুন্নাহবিরোধী নিষেধাজ্ঞা যেসব 'ফেতনা'র আশংকা থেকে আরোপ করা হয়েছে, সেসব 'ফেতনা' তৎকালীন সময়েও কমবেশি ছিল। তাই বলে তখন নারীদের মসজিদে যাতায়াত বন্ধ করা হয়নি।

কানাডিয়ান মুসলিম নারী জারকা নেওয়াজ ২০০৫ সালে 'মি অ্যান্ড দ্যা মস্ক' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। ইসলামে নারীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা, কানাডার মসজিদগুলোর বর্তমান অবস্থা, মসজিদে নারীদের যথাযথ অধিকার স্বীকৃত না হওয়ার বিষয়ে ডকুমেন্টারি উপস্থাপকের ক্ষোভ, আশংকা, উপেক্ষা ও সমঝোতার গল্পগুলো এতে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। একটি সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের ধারণা।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এটি অনুবাদ করেছেন সিএসসিএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মাসউদুল আলম। পুরো অনুবাদটি আমি আগাগোড়া ভালো করে দেখে দিয়েছি।

যেসব জায়গায় আমরা প্রয়োজন বোধ করেছি, সেখানে টীকা দিয়েছি। ক্লারিফিকেশনের জন্য কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের দ্বিমত প্রকাশের জন্য। আমরা আশা করি, সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই ডকুমেন্টারিতে যারা

বক্তব্য দিয়েছেন তাদের সামগ্রিক কার্যক্রম বা ব্যক্তিচরিত্রের পরিবর্তে তাদের কথাগুলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে পাঠ করা হবে।

প্রায় পাঁচ বছর আগে 'মি অ্যান্ড দ্যা মস্ক: আমার মসজিদ আমার অধিকার' তথ্যচিত্রটির ভাষান্তর সম্পন্ন করে সিএসসিএসি-এর ওয়েবসাইটে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে মূলত নারীদের মসজিদে প্রবেশাধিকারের চেয়েও মসজিদে নামাজ আদায়, মসজিদভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও মসজিদ পরিচলনায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ন্যায্য অংশগ্রহণের উপর বেশি ফোকাস করা হয়েছে। এর কারণ হলো, পাশ্চাত্যের মসজিদসমূহে সাধারণত নারীদের প্রবেশাধিকার থাকে, যা ভারতীয় উপমহাদেশের মসজিদসমূহে সাধারণত নেই। সেখানকার বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতায় পশ্চিমা বিশ্বের মসজিদসমূহ কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে গড়ে উঠে।

আমাদের দেশে যেহেতু নারীদের মসজিদে প্রবেশাধিকারই সামাজিকভাবে ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে স্বীকৃত নয়, তাই নারীদের মসজিদে প্রবেশাধিকারের উপর ফোকাস করে রচিত 'রিক্লেইমিং দ্যা মস্ক: মসজিদে নারীদের উপস্থিতি' শিরোনামে একটা বইয়ের অনুবাদ আমরা প্রকাশ করেছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নারীদের মসজিদে প্রবেশ করতে না দেওয়ার এই সামাজিক ও ধর্মীয় কুপ্রথা অচিরেই উঠে যাবে। মসজিদগুলো হয়ে উঠবে সকল প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এই ঐতিহাসিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার তৌফিক আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, সে জন্য মহান আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

১৫ এপ্রিল ২০২১
এস.ই. ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
mozammelhq.com

সূচিপত্র

শুরুর কথা ৯

টরেন্টোয় ভাইয়ের বাড়িতে ১৩

মিসিসাগায় মায়ের কাছে ১৫

উইনিপেগ মসজিদে ১৯

নারীদেরকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে রাখা ২৫

নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য ২৭

টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১

ইটরাথ সাঈদের সাথে আলাপচারিতা ৩৫

তাকওয়া মসজিদে ৩৯

আমেরিকায় ৪৩

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় ৪৭

তারিক সোয়াইদানের সাথে ৫৩

ম্যানিটোবার ক্যাম্পিংয়ে ৫৫

সংস্কৃতি বনাম ধর্ম ৫৯

পরিবর্তনের সূচনা ৬৩

শুরুর কথা

মসজিদে নারীদের জন্য অপ্রতুল ব্যবস্থাপনা নিয়ে **কমেডিয়ান আজহার ওসমান** এক অনুষ্ঠানে কৌতুক করছিলেন। তার রসাত্মক বর্ণনা অনেকটা এ রকম—

> "মসজিদে নারীদের প্রবেশাধিকার নিয়ে এতো হইচই করার কী আছে, আমার বুঝে আসে না। হ্যাঁ, নারীদেরও নামায পড়ার দরকার হয় বটে! আর মসজিদ তো ইবাদতের স্থান। তাই তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার সুযোগ বোধহয় দেওয়াই উচিত। অ! আপনি মসজিদে নারীদের জন্য ভালো ব্যবস্থাপনা থাকার কথা বলছেন?
>
> মাশাআল্লাহ, আমরা খুব চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাদের জন্য রয়েছে একটা খুপড়ি। খুবই চমৎকার খুপড়ি। মাশাআল্লাহ, সেখানে অসাধারণ সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থাও রয়েছে। অবশ্য সেটা নষ্ট! গরমকালের জন্য রয়েছে দারুণ কুলিং সিস্টেম! খুপড়িটিতে আমরা দুই দুইটি ফ্যান দিয়েছি। অবশ্য বাইরের তাপমাত্রা যখন ৪৭ ডিগ্রি, ভেতরে তখন ৩৭ ডিগ্রি!"

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেটের আরোরা মসজিদে এক খুতবায় বলা হচ্ছিল—

> "মার্টিন লুথার কিংয়ের কিছু উক্তি আপনার সাথে তুলে ধরতে

> চাই। খুবই ইন্টারেস্টিং কথা। লুথার বলেছেন, কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করার আগে আপনাকে চারটি ধাপ পার হতে হবে।
>
> প্রথমত, আদতেই অন্যায়টি সংঘটিত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত হতে হবে।
>
> দ্বিতীয়ত, আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে সত্যিই আপনার সাথে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে, তখন যারা অন্যায় করছে প্রথমে তাদের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করতে হবে।
>
> আর তৃতীয় ধাপটি হলো....।"

এখানে লক্ষ্যণীয়, মুসলমানদের প্রতি অন্যদের অন্যায় আচরণ নিয়ে আমরা সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু নিজেদের সমাজে ঘটে চলা অন্যায় কর্মকাণ্ড নিয়ে মুসলমানদেরকে খুব একটা কথা বলতে দেখি না। আমি যে মসজিদে নামায পড়ি, সেখানে নারীদের নামাযের স্থানের সামনে একটি গ্লাস লাগানো আছে। গ্লাসের এই প্রান্ত থেকে ভেতরটা দেখা যায়, কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে পুরুষরা আমাদের দেখতে পায় না। আমাকে বলা হয়েছে, নারীরা পুরুষদের মনোযোগ নষ্ট করে দেয়, তাই এই ব্যবস্থা। অথচ, আমি তো তাদেরকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারা দেখছে নিছক একটি গ্লাস। এসব কারণে আমাদের মসজিদে এখন নারীদের যাতায়াতই বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়।

আমার স্বামী সামিউল হকের কথা হলো,

> "খুতবা শুনলে মনে হয়, ইসলাম কত চমৎকার! ইসলাম নারীদেরকে সকল অধিকার দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা সেগুলো কাউকে পালন করতে দেখি না। আমি অন্তত দেখিনি। এমনিতে নারীদের অধিকার নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়। সুন্দর সুন্দর সব কথা। কিন্তু সবই নিছক তত্ত্বকথা মাত্র।"

অথচ আমার ছোটবেলায় এগুলো নিছক তত্ত্বকথা ছিল না।

তখন আমি মসজিদে যেতে ভালোবাসতাম। একটি পুরনো চার্চকে সংস্কার করে টরেন্টোর সেই মসজিদটি বানানো হয়েছিল। মেয়ে হওয়ার কারণে আমাকে কখনোই সেখানে ভিন্ন চোখে দেখা হতো না। মনে পড়ে, তখন আমার ছুটির দিনগুলো কাটতো মসজিদভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামী কর্মকাণ্ড আয়োজনের পেছনে। একজন মুসলমান হিসেবে বেশ ভালোই ছিলাম।

আমি সামিকে বিয়ে করি। সে আমার মতোই কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পছন্দ করে। আমাদের বিয়ে হয় মসজিদে। কারণ, আমরা দুজনই মসজিদকে নিজেদের বাড়ির মতো মনে করতাম। তারপর আমরা সেন্ট্রাল কানাডার সাসকাচোয়ান প্রদেশের রাজধানী রেজিনায় চলে আসি। মাইশা, ইনায়া, রুশাদ এবং জেইন, আমাদের এই চারটি উচ্ছ্বল ও প্রাণবন্ত সন্তান।

তাদেরকে আমরা মসজিদে পাঠাই শুধু ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্যই নয়; বরং মসজিদে তাদের আসা-যাওয়ার মাধ্যমে নারীদের ব্যাপারে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যেন ঘটে, সেটাও আমাদের উদ্দেশ্য।

নারীদের মসজিদে যাতায়াতের ব্যাপারে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে **'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম উইম্যানের' পরিচালক আমিনা অ্যাসিলমি** আমার সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> "প্রায় ২৭ বছর আগে আমি মুসলমান হয়েছি। সবসময় দেখে এসেছি কিছু মানুষ বলার চেষ্টা করছেন, নারী-পুরুষের নামাযের স্থান সম্পূর্ণ পৃথক থাকা উচিত। কেউ কেউ আরেক ধাপ এগিয়ে বলে থাকেন, নারীদের মসজিদে যাতায়াতই নিষিদ্ধ করা উচিত।
>
> তারা মনে করেন, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সুন্নাহর দলীল

রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহর উদাহরণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সবসময়ই আমরা এগুলো মোকাবেলা করে আসছি, ভবিষ্যতেও করে যেতে হবে। আমরা যদি তা না করি, তাহলে এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।"

আমাদের মসজিদে দীর্ঘদিন যাবৎ পুরুষদের পেছনে দাঁড়িয়ে নারীরা নামায আদায় করে আসছিল। কোনো সমস্যা হয়নি। হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখি মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলছে। নারীরা পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে বাধ্য হচ্ছে। নারীদের জন্য পুরুষরা পর্যাপ্ত জায়গা তো রাখেইনি, তার উপর একটি পৃথক রুম তৈরি করেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে তখন কয়েকজন নারী পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি তাদের সাথে যোগ দিলাম। এই ঘটনায় আমার চিরচেনা দুনিয়া যেন পাল্টে গেলো। মসজিদ ছিল আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ এখন মনে হচ্ছে, আমি যেন এখানে অনাহূত। আমি ভীষণভাবে আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা অনুভব করছিলাম।

আমার চিরচেনা এই মসজিদটি নিয়ে নানা ধরনের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। মসজিদের পরিবেশকে আবার আগের অবস্থায় কি ফিরিয়ে আনা সম্ভব? মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে আমার কমিউনিটি কেন এভাবে আমূল পাল্টে গেলো? আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, দেশজুড়ে ঘুরে ঘুরে এই প্রশ্নগুলোর জবাব পাবার চেষ্টা করবো।

টরেন্টোয় ভাইয়ের বাড়িতে

প্রথমে গেলাম টরেন্টোতে অবস্থিত **আমার ভাই মুদাসসির ডাচ নেওয়াজে**র বাড়িতে। এ বিষয়ে তার সাথে আমার নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়:

আমি: তুমি তো জানো, রেজিনায় আমাদের মসজিদে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। নারীরা পুরুষদের পেছনে নামায আদায় করতো। গত ১৫ বছরে কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি। কিন্তু একজন ইন্ডিয়ান ইমাম নিয়োগের পর থেকে পরিস্থিতি রক্ষণশীলতার দিকে মোড় নিতে থাকে। একবার আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশে ৯/১১ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলাম। এ ঘটনার পর ইমাম সাহেব খুতবায় বললেন, পর্দার আড়াল ছাড়া কোনো মুসলিম নারী পুরুষদের সামনে কথা বলতে পারে না। এটা একশ ভাগ হারাম। সেদিন খুতবার পুরো সময় জুড়ে তিনি এসব কথাই বলছিলেন।

আমি মনে করি, ব্যাপারটি তারা যেভাবে বলছে সে রকম সাদাকালো টাইপের কিছু নয়। তাছাড়া পুরুষদেরও পর্দার ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব আছে। পুরো বিষয়টা নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তুমি ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখো?

মুদাসসির: আমার পরামর্শ হলো, তোমাকে অনেক অনেক সতর্ক থাকতে হবে।

আমি: কেন?

মুদাসসির: কারণ, তুমি যা করতে যাচ্ছো তাতে প্রচুর শত্রু তৈরি হবে।

আমি: কেন?

মুদাসসির: তুমি কি জানো, এর পরিণতি কী দাঁড়াবে?

আমি: মুসলমানরা যে সত্যিকার মুসলমানের মতো আচরণ করছে না, আমি সেটা তুলে ধরতে গেলে তারা আপসেট হয়ে পড়ে। কারণ...

মুদাসসির: কারণ, যে কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে। বিশেষ করে তা যদি কোনো মুসলমান করে থাকে, তাহলে আরো বেশি সমস্যা হয়।

আমি: মুসলমানদের একটা অনৈসলামিক কাজ দেখে কোনো অমুসলিম বলে ফেলতেই পারে— দেখো, মুসলিম পুরুষরা কীভাবে তাদের নারীদেরকে দমিয়ে রাখছে। আমি মনে করি, এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই কোনো মুসলমান যদি ইস্যুটি নিয়ে কথা বলে, সেটাই বরং ভালো।

মুদাসসির: তা ঠিক। কিন্তু অন্যরা ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছে, সেটা হলো আসল কথা। তুমি আমাদেরকে ভুলভাবে তুলে ধরছো, বাস্তবে যা আমরা এখনো করিনি।

মিসিসাগায় মায়ের কাছে

তারপর আমি গিয়েছি মিসিসাগায়। আমার মায়ের কাছে। তার প্রিয় মসজিদটিতে গিয়েছিলাম। ইসলামিক সেন্টার অব কানাডার এই মসজিদে প্রায় প্রতিদিনই তিনি নামায পড়তে যান। তিনি বড় হয়েছেন পাকিস্তানে। সেখানে নারীরা কখনোই মসজিদে যেত না। মসজিদে নারীদের নামাযের স্থানের সামনে পার্টিশন থাকা না থাকা প্রসঙ্গে মায়ের সাথে আমার কখনোই মতের মিল হয়নি। পুরুষরা কেন আমাদের নিয়ে এতো আপসেট, সেটা তিনি কখনোই বুঝতে চাননি। **আমার মা পারভীন নেওয়াজে**র সাথে মসজিদে বসে নিম্নোক্ত কথোপোকথন হয়। মা-ই প্রথম শুরু করলেন:

মা: বাচ্চাদের একা ফেলে এসেছো কেন? সবসময়ই তুমি এ রকম অবহেলা করো।

আমি: সামি (আমার স্বামী) তাদের সাথে আছে তো। তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

মা: না, তুমি মনে করছো তারা ভালো আছে। কিন্তু মনে মনে বাচ্চারা সবসময় মাকে খুঁজে বেড়ায়।

আমি: যাকগে, তুমি নিশ্চয় জানো, মসজিদে পার্টিশন বা পর্দা থাকাকে আমি কতটা অপছন্দ করি?

মা: তাহলে মসজিদে না গেলেই তো পারো।

আমি: না যাওয়ার কথা নয়, আমি বরং মসজিদকে আমি খুব পছন্দ করি।

মা: কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে কি এটা ঠিক আছে? (সামনের নিচু পার্টিশন দেখিয়ে)

আমি: হ্যাঁ, এটাতে অসুবিধা নাই। কারণ, এটা নিচু পার্টিশন। উপর দিয়ে সামনে দেখা যায়। তুমি এটা পছন্দ করো না?

মা: হ্যাঁ, আমারও এটি ভালো লাগে। পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়াকে আমিও পছন্দ করি না।

আমি: তুমি তাহলে পর্দা ঝুলানোকে পছন্দ করো না?

মা: না। এই মসজিদের মতো নিচু পার্টিশন আমার পছন্দ।

আমি: আচ্ছা, পাকিস্তানের কী অবস্থা? তুমি তো সেখানে বড় হয়েছো। কখনো কি মসজিদে যেতে?

মা: কখনোই না।

আমি: কেন?

মা: কারণ, সেখানে অনেক পুরুষের সমাগম থাকে। আর মসজিদগুলো খুব একটা বড় নয়। তাছাড়া নারীদের জন্য সেখানে কোনো ব্যবস্থাও নেই।

আমি: তারা মনে করে, নারীদের মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই না?

মা: না, ঠিক তা নয়। এমন কথা আমি কখনো শুনিনি। তবে ঠিক কী কারণে সেখানকার নারীরা মসজিদে যায় না, তা আমি ঠিক বলতে পারবো না।

আমি: তাদের মসজিদে না যাওয়ার কারণ হলো, সেখানে নারীদের মসজিদে যাওয়াকে ভালো চোখে দেখা হয় না। পুরুষরা চায় না নারীরা সেখানে যাক। তাই তাদের মসজিদে যাওয়াটা বেশ কঠিন। এ দেশে আসার পর তোমাকে মসজিদে স্বাগত জানানো হয়েছে। এখানে সেখানকার মতো সামাজিক প্রথা নেই। এই দেশে এসে কি ইসলাম সম্পর্কে তুমি আরো ভালোভাবে জানতে পারছো না?

মা: হ্যাঁ, মসজিদে আসতে পারায় আরো বেশি জানতে পারছি। মসজিদে না আসলে জানা বা শেখার আর উপায় কি, বলো?

আমি: মসজিদে পার্টিশন বা পর্দা না থাকলে তো শেখার ক্ষেত্রে নারীদের সুবিধা হয়।

মা: কিন্তু কেউ কেউ আড়ালে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারে। আমি এতে আপত্তি করবো না।

আমি: তারমানে, পার্টিশন বা পর্দা থাকলে তোমার কোনো আপত্তি নেই। তাই তো?

মা: ঠিক তা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, লোকেরা পার্টিশন বা পর্দা টানিয়ে দিলে আমি তাদের সাথে বিবাদে জড়াতে যাবো না।

আমি: তবে যেখানে পার্টিশন বা পর্দা নেই, সেখানে যেতেই তুমি পছন্দ করবে। তাই তো?

মা: ঠিক তাই।

আমি: দেখো, তুমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার কথাই সমর্থন করলে।

মা: হ্যাঁ, তা করেছি বটে।

উইনিপেগ মসজিদে

পুরো উত্তর আমেরিকা জুড়ে সহস্রাধিক মসজিদ রয়েছে। এরমধ্যে শুধু কানাডায় রয়েছে আনুমানিক ১৪০টি মসজিদ। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৫২ শতাংশ মসজিদেই নারীদের নামাযের স্থান হয় পর্দাঘেরা, নয়তো রয়েছে আলাদা পার্টিশন। এ ধরনের মসজিদের সংখ্যা বেড়ে ২০০০ সাল নাগাদ ৬৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এমন একটি মসজিদ রয়েছে ম্যানিটোবার উইনিপেগ শহরে। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত পার্টিশন দেওয়া। 'ম্যানিটোবা ইসলামিক এসোসিয়েশন' এটি পরিচালনা করে। সেই মসজিদে আমি, শাহীনা সিদ্দিকী এবং ডিয়ানা ডিসান্টিজের সাথে কথা বলেছি। **শাহীনা সিদ্দিকী 'ইসলামিক সোশ্যাল সার্ভিসেস এসোসিয়েশন অব কানাডা'র প্রেসিডেন্ট** হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আর **ডিয়ানা ডিসান্টিজ উইনিপেগ শহরের মুসলিম কমিউনিটির একজন নারী**।

জারকা নেওয়াজ: প্রথম কখন এখানে পার্টিশন দেওয়া হয়?

শাহীনা সিদ্দিকী: আমার ধারণা ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে এটি চালু হয়।

ডিয়ানা ডিসান্টিজ: আমি অবশ্য বেশিদিন আগে এখানে আসিনি। মাত্র ১৩ বছর হলো। তখন এই পার্টিশনটি হাঁটু-পরিমাণ উঁচু ছিল।

আমার ধারণা, তারা ধীরে ধীরে এটি উঁচু করেছে। বোন শাহীনা শুরু থেকেই এখানে ছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে আরো ভালো বলতে পারবেন।

শাহীনা সিদ্দিকী: তবে সেই নিচু পার্টিশনই তাদেরকে আজ এই ছাদ সমান উঁচু পার্টিশন দেওয়ার সাহস যুগিয়েছে।

জারকা নেওয়াজ: আমার প্রথমেই মনে হয়েছে, নারীরা যেন পুরুষদের নজরে না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য নারীদেরকে এই চরম ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বিল্ডিংটির অন্যান্য অংশের চেয়ে আলাদা এই পার্টিশনটি যে বিশেষ কোনো ভাবনা থেকে করা হয়েছে, তা দেখলেই বুঝা যায়।

শাহীনা সিদ্দিকী: মসজিদের এই দরজাগুলোও কি তারা পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দিতে চায়নি?

ডিয়ানা ডিসান্টিজ: বন্ধ করেই দিয়েছিল। নারী ও শিশুরা যেন দরজা খুলতে না পারে সেজন্য গত বছর তারা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ, দরজাগুলো আমাদের দিক থেকে খোলা যেত। একদিন এসে দেখি কোনো দরজাই খুলতে পারছি না। ভেতর দিকে দরজার উপর দিকে কাঠের টুকরা বসিয়ে তারা দরজাগুলো আটকে দিয়েছিল। এ ঘটনায় আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করলে তারা কিছু দরজা খুলে দেয়।

শাহীনা সিদ্দিকী: পার্টিশনের যে গ্রিল লাগানো হয়েছে, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ভালো করে কিছু দেখা যায় না। পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বা ওভারহেড প্রজেক্টরে কিছু দেখানো হলে এখানে বসে নারীরা তা দেখতেই পাবে না। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে **ম্যানিটোবা ইসলামিক এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ড. ঘাসসান জোনদী**র সাথে আমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়:

আমি: শুরুর দিকে তো এখানে (মসজিদের মাঝখানে) কোনো পর্দা বা দেয়াল ছিল না। তাই না?

ড. ঘাসসান: হ্যাঁ, শুরুতে এখানে কোনো পর্দা বা দেয়াল ছিল না। আমি অন্তত এ রকম কিছু থাকার কথা শুনিনি।

আমি: আপনি যখন এখানে আসেন, তখন দেয়াল তৈরির কাজ চলছিল। তাই না?

ড. ঘাসসান: আমি যখন এখানে আসি, ততদিনে সম্ভবত দেয়াল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আমি একে ঠিক দেয়াল বলবো না।

আমি: তাহলে কী বলবেন?

ড. ঘাসসান: একে পার্টিশন বলা যেতে পারে।

আমি: ঠিক আছে। তো পার্টিশন যখন...

ড. ঘাসসান: দেয়াল শব্দটা বললে কেমন যেন লাগে। মনে হয় যেন কোনো স্থান দখল করার জন্য দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। বৈষম্যের দেয়াল, দখলদারিত্বের দেয়াল— এ ধরনের অনুভূতি হয়। তাই পার্টিশন বলাই ভালো।

আমি: পার্টিশন...

ড. ঘাসসান: এটা মূলত নারী-পুরুষের মধ্যে এক ধরনের পৃথকীকরণ। যতক্ষণ এখানে কোনো পুরুষের উপস্থিতি থাকবে না, ততক্ষণ নারীরাও পুরুষদের জন্য নির্ধারিত এই অংশে আসতে

পারবে। আপনি জানেন, ইসলামে নারী-পুরুষের মেলামেশা তথা একত্রে অবস্থানকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আর এ কারণেই এই ব্যবস্থা।

উইনিপেগ মুসলিম কমিউনিটির আরো দুজন নারীর সাথে আমার কথা হয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ড. ঘাসসানের কথার টোনের সাথে মিলে যায়।

অ্যাশি নাসিম: দেওয়ালের আড়ালে নামায আদায় করতে আমি স্বস্তিবোধ করি। আমার মনে হয়, ইসলামের দিক থেকে এটা তাকওয়ার কাছাকাছি। অন্য অনেক বিষয়ে আমরা পুরুষদের সাথে কথা বলতে পারি, কাজ করতে পারি। কিন্তু নামায আদায়ের জন্য অনেক বেশি মনোযোগের প্রয়োজন। কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না বা তাকানোর সুযোগ নেই— নামাযে পূর্ণ মনোযোগের জন্য এমন পরিবেশ অধিক উত্তম। এতে আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

শাহীনা আওয়ান: আমার অনুভূতিও একই রকম। আমাদের এখানে এই পর্দার ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। এটি থাকা না থাকা নিয়ে আগে কখনোই সমস্যা হয়নি। এখন কেন এটি নিয়ে কথা উঠছে, তাতে আমি বেশ অবাক হচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে শাহীনা ও ডিয়ানার কাছে আবার ফেরা যাক। তারা কী বলে দেখি—

শাহীনা সিদ্দিকী: আমার কাছে মনে হয়, ব্যাপারটা আসলে সাংস্কৃতিক। এখানে জেন্ডার বৈষম্য ও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত অনুমান কাজ করে। হ্যাঁ, কেউ কেউ তাদের এই অবস্থানের পক্ষে কোরআন থেকে দলীল দেখানোর কসরত করেন। যেন এই ব্যবস্থা সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। বিশেষত নবীজীর (সা.) সময়ও যেন ছিল। কিন্তু আসলে তো তেমনটা ছিল না। তাদের নিজেদের ধারণাই শুধু

ইসলামসম্মত— এমনটা ভেবে ও বিশ্বাস করেই তারা অভ্যস্ত। তাই মসজিদে নারীদেরকে সমঝে চলা উচিত, এমন একটা মনোভাব তাদের মাঝে কাজ করে।

ডিয়ানা ডিসান্টিজ: ইসলাম গ্রহণের আগে আমি আর একটা ধর্মও খুঁজে পাইনি, যারা নারীদেরকে এত উচ্চ সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে। তখন আমার মনে হয়েছে, ওয়াও! এমনটাই তো আমি খুঁজছি! এখন থেকে 'নারী স্বাধীনতা' বাদ, ইসলামই বরং ভালো। কিন্তু প্রত্যেকটা সমাজেই যে এই সমস্যাগুলো বিদ্যমান, ১৩ বছর আগে তা জানতাম না। এসব কারণে আমি এই মসজিদে খুব কম আসি।

শাহীনা সিদ্দিকী: এটা সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার। অথচ এই মসজিদের প্রাণবন্ত পরিবেশের সাথে আমরা একসময় অভ্যস্ত ছিলাম।

ডিয়ানা ডিসান্টিজ: আরেকটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ইসলাম নিয়ে জানাশোনার মাঝেপথেই আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলি। আসলে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, মসজিদ ক্যাথলিক চার্চের মতো নয়। চার্চে বসতে হয় বেঞ্চিতে, নিজের পরিবারের সাথে। এর তুলনায় মসজিদের পরিবেশ আমার কাছে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ মনে হয়েছে। এখানে আমি অন্যান্য নারীর সাথে একই কাতারে বসতে পারি। বক্তব্য শুনতে পারি। সম্মিলিতভাবে সবার নামায আদায়ের পদ্ধতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এই দৃশ্য আমাকে নাড়া দেয়। আমার হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। কিন্তু তারা যখন আমার সামনে দেয়াল তুলে দেয়, তখন ভাবি, আমি কী দোষ করেছি! আমি তো কোনো অন্যায় করছি না, নামায আদায়ের চেষ্টা করছি মাত্র।

ডিয়ানার এই আবেগ ও প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি পুনরায় **ড. ঘাসসানে**র কাছে গেলাম—

ড. ঘাসসান: ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থী ধর্ম। এই পার্টিশন দেওয়ার মাধ্যমে আমরা একটি মাঝামাঝি সমাধান দিয়েছি।

আমি: মহানবীর (সা.) সময়ে মসজিদের মাঝখানে তো দেয়াল বা পর্দার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে এটি কীভাবে মধ্যপন্থী সমাধান হয়? অথচ সেই সময়টাই ছিল সর্বোত্তম সময়!

ড. ঘাসসান: হ্যাঁ, তখন ছিল না। কারণ, ওই সময়টা ছিল সর্বোত্তম সময়। আর তাঁরাও ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ।

আমি: তখনো কিন্তু পুরুষরা নারীদের দিকে তাকাতো।

ড. ঘাসসান: তারা ছিলেন সর্বোত্তম সময়ের সর্বোত্তম মানুষ। তাদের সাথে আমরা বর্তমানের তুলনা করতে পারি না।

নারীদেরকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে রাখা

কেন আমরা তখনকার সাথে এখনকার তুলনা করতে পারি না? সাধারণ মানুষ যেসব সমস্যায় জর্জরিত, সেই সমাজ কি এসব সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল? ইসলামী সভ্যতার অতীত গৌরব নিয়ে আমরা সাধারণত এমনটা শুনে থাকি:

> "শত শত বছর ধরে ইসলাম সাফল্যের সাথে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের ছিল বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী সেনাবাহিনী। ইসলামী সভ্যতা জন্ম দিয়েছে মহান সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের।...."

একটা মিনিট থামুন, প্লিজ। হ্যাঁ, মুসলিম বিশ্বের দীর্ঘ 'সোনালী অতীত' ছিল এবং সেই ঐতিহ্যের একটি ধারাবাহিকতা এখনো গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। সেটি হলো নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখা। আসলে আরো অনেক নারীর মতো আমিও মনে করি, মহানবীর (সা.) সময়কালই ছিল ইসলামের সত্যিকারের সোনালী যুগ। এসব বিষয় নিয়ে আমি **নববী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. ওমর ফারুক আব্দুল্লাহ**কে জিজ্ঞেস করেছিলাম:

> "ইসলামের সমতাভিত্তিক সমাজের ধারণা থেকে কেন আমরা সরে যাচ্ছি? কেন এত দ্রুত সামাজিক অবক্ষয় ঘটছে?"

জবাবে তিনি বলেন:

> “উনিশ ও বিশ শতকে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় একটি বাস্তবতা। মুসলিম ও সেক্যুলার উভয় ঘরানার পণ্ডিতদের কাছেই এটি স্বীকৃত। বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মহান মুসলিম চিন্তাবিদ ও সংস্কারক লক্ষ করেছেন, মুসলিম বিশ্বের ক্রমাগত পতনের কারণ ছিল নারীদেরকে ক্ষমতাহীন করে রাখা, দমিয়ে রাখা এবং তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। এসব কারণে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। তাই যে কোনো বিষয়কে সবসময় স্থান-কালের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা উচিত।”

নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য

মহানবীর (সা.) কথা, কাজ বা পরোক্ষ সম্মতি সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর সমষ্টি হলো হাদীস। হাদীস থেকে প্রথম যুগের মুসলিম সমাজের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। কোরআনের পরেই ইসলামে জ্ঞানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো হাদীস।

রাসূলের (সা.) যুগে মসজিদে নারীদের নামাযের স্থানকে আড়াল করে রাখার ব্যাপারে হাদীসে কী বলা আছে, আমি তা জানার চেষ্টা করেছি। এ জন্য খ্যাতিমান হাদীসশাস্ত্রবিদ **শায়খ আব্দুল্লাহ আজমী**র সাথে কথা বলেছি—

শায়খ আজমী: আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে এ পর্যন্ত রচিত সবগুলো হাদীসের সংকলন অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার কাছে এটি অকল্পনীয় সম্মানজনক ব্যাপার। শুধু অধ্যয়নই নয়, হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে বিশুদ্ধ মনিমুক্তাগুলো খুঁজে বের করা এবং বাছাই করতে পারার সৌভাগ্যও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি অসীম বদান্যতা।

আমি: মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ মদীনার মুসলিম সমাজেও যে মসজিদে নারীদের জন্য আড়াল ছিল না, এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

শায়খ আজমী: তখনো সমাজের কিছু পুরুষ নারীদের কাতারের কাছাকাছি থাকার উদ্দেশ্যে পুরুষদের শেষ কাতারে দাঁড়াতো। এই পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) একদিন বললেন, পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো সামনের কাতার। সুস্পষ্ট প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও রাসূলের (সা.) নির্দেশনাটি ছিল একেবারেই সাধারণ। এ ধরনের আরো ঘটনা রয়েছে। একদম ছোটোখাটো ঘটনার বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু নারী-পুরুষের নামাযের জায়গার মাঝখানে কোনো আড়াল দেওয়ার বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এটি কখনোই ইস্যু ছিল না।

অনেকগুলো হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, রাসূলের (সা.) যুগে এ ধরনের আড়াল ছিল না। যেমন একটা হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তখন পুরুষদের কারো কারো কাপড় খুবই অপর্যাপ্ত ছিল। ফলে রাসূল (সা.) নারীদেরকে সেজদা থেকে কিছুটা দেরিতে মাথা তুলতে অনুরোধ করেছিলেন, যেন পুরুষরা এ সময়ের মধ্যে নিজেদের কাপড় ঠিকঠাক করে নিতে পারে।

মসজিদে খুতবার কোনো অংশ মিস করে গেলে তৎক্ষণাৎ পুরুষদেরকে জিজ্ঞেস করে তা জেনে নেওয়া নারীদের জন্য তখন কোনো অসুবিধার ব্যাপার ছিল না।

এমনকি, নারীরা তখন মসজিদে নিজেদের মতামতও প্রদান করতে পারতো। একবার দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) দেনমোহরের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন একজন নারী কোরআনের আয়াত উল্লেখ করে এই প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

তখন নারীরা শুধু মসজিদই নয়, নানা ধরনের সামাজিক কাজেও সক্রিয় ছিল। তারা সেনাবাহিনীতেও অংশগ্রহণ করতো। এমনকি স্বয়ং ওমর

(রা.) একজন নারীকে মদীনার বাজারের (যেখানে খুব বেশি জনসমাগম ঘটতো) তদারককারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি দূরবর্তী মিশনে নিয়োজিত পুরুষদেরকে নিজের স্ত্রীদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চার মাসের মাথায় বাড়ি ফেরার নির্দেশ দিতেন।

চলুন, শায়খ আব্দুল্লাহ আজমীর সাথে কথোপকথনে ফিরে যাই।

আমি: বর্তমানে পুরুষরা যে ধরনের ফিতনার আশংকা করে (পুরুষরা সুন্দরী নারীদের দিকে তাকানো, কিংবা নারীরা পুরুষদের দিকে তাকানো ইত্যাদি), তখনো কি সেই সমস্যাগুলো ছিল না? মহানবীর (সা.) সময়কালেও কি এসব ঘটেনি? আপনার দেওয়া উদাহরণ থেকে তো তেমনটাই বুঝা যায়।

শায়খ আজমী: হ্যাঁ, ঘটেছিল।

আমি: তারপরও মহানবী (সা.) মসজিদে নারীদের জন্য কোনো আড়াল তৈরি করেননি। তাই না?

শায়খ আজমী: চমৎকার পয়েন্ট। এটাই আসলে মূল কথা। রাসূলের (সা.) যুগে মসজিদে পার্টিশন বা আড়াল না থাকার অনেক প্রমাণ রয়েছে। ট্র্যাডিশানাল ফিকাহবিদরা ধরেই নিয়েছেন, যত জরুরি প্রয়োজনই থাকুক না কেন নারীদের একা ভ্রমণ করা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। অথচ এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, তৎকালীন খ্যাতিমান নারী স্কলারগণ মুসলিম বিশ্ব জুড়ে সফর করে করে মসজিদগুলোতে ক্লাস নিয়েছেন।

আমি: তারা কি পর্দার আড়ালে থেকে ক্লাস নিতেন?

শায়খ আজমী: না। কেউ কেউ বরং মিম্বরে বসেই ক্লাস নিতেন। ফাতিমা বিনতে আব্বাস ছিলেন তৎকালীন সময়ে খুবই খ্যাতিমান।

তিনি ইবনে তাইমিয়ার সমসাময়িক ছিলেন। মিম্বরে বসেই তিনি পড়াতেন।

আমি: তিনি মিম্বরে বসতেন এবং পুরুষদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিতেন?

শায়খ আজমী: তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের মিশ্র সমাবেশে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

আমি: তাঁর মুখ কি খোলা থাকতো?

শায়খ আজমী: হ্যাঁ।

আমি: তাহলে কি তিনি বৃদ্ধা ছিলেন? কেউ কেউ বলে, তিনি সম্ভবত খুব বয়স্কা...

শায়খ আজমী: না, তিনি কম বয়সী ছিলেন। তৎকালীন মদীনার সমাজের নারীরা আসলে বর্তমান আধুনিক মুসলিম বিশ্বের নারীদের চেয়েও অধিকতর প্রগতিশীল চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে

কানাডায় বসবাসরত মুসলমানদের ৯১ শতাংশেরই জন্ম ও বেড়ে ওঠা মুসলিম বিশ্বে। মাত্র ১০ শতাংশ এখানে বড় হয়েছেন। সেদিক থেকে আমি নিজের সমাজেই সংখ্যালঘু। অর্থাৎ, অধিকাংশ মুসলমানই মসজিদে পার্টিশন বা পর্দা থাকাতে অভ্যস্ত। এমতাবস্থায় আমার প্রজন্মের নারীরা কোথায় যাবে?

প্রফেসর আসমা বারলাসের বক্তব্য শোনার জন্য আমার বান্ধবীর সাথে গিয়েছিলাম টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইসলামে সমতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> "পুরুষের দৈহিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তার বিশেষ ভূমিকা পালনের পক্ষে কোরআনের একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না। কিংবা, দৈহিক গঠনগত পার্থক্যের কারণে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্যের ধারণাও পাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে কোরআনে নারী-পুরুষকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তারমানে এই নয় যে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য করা হয়েছে। নিজেদের ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে এবং হৃদয়ে সত্যকে ধারণ করতে না পারলে আমাদের দ্বারা কোনো পরিবর্তন আনাই সম্ভব নয়। কোরআন এমন কথাই বলে।"

আধ্যাত্মিক দিক থেকে ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। কিন্তু মুসলিম পুরুষরা

নানা ধরনের বিভাজন তৈরি করে রাখায় এই প্রজন্মের নারীরা হতাশায় ভুগছে। **টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরি**তে এসব বিষয় নিয়ে আমরা একটি মুক্ত আলোচনা করেছি। এখানে তা তুলে ধরলাম—

আয়েশা গেসিনজার
(পিএইচডি শিক্ষার্থী, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব রিলিজিয়ন, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়):

মসজিদে নামায পড়া নিয়ে আমার একটি বিব্রতকর অভিজ্ঞতা আছে। আমার উপস্থিতির কারণে নাকি কিছু মুসলিম ভাইয়ের কামভাব জেগে ওঠে! অথচ আমার ১৭ বছর বয়সী একটা ছেলে আছে। আর ওই মুসল্লীরাও মধ্যবয়সী পুরুষ। নিছক আমার উপস্থিতির কারণেই যদি আপনার কামভাবে জেগে ওঠে, তাহলে সমস্যাটা তো একান্তই আপনার। আমার কিছু করার নেই। আমি যে এ ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী নই, তা নিশ্চয় আপনার জানা থাকার কথা।

জেসমিন জাইন
(প্রভাষক, ওআইএসই, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়):

আমি তখন আন্ডারগ্রেডে পড়ি। মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের (এমএসএ) এক অনুষ্ঠানে গিয়েছি। জুমার দিন ছিল। 'বোনদের জন্য একটি কম্পাউন্ডে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা রয়েছে'— এ ধরনের একটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পুরুষদের মধ্যে আপত্তি ওঠলো যে নামাযের সময় এটা কেমন ঘোষণা দেওয়া হলো! অথচ সেখানে এ জাতীয় বিভিন্ন ঘোষণা নিয়মিতই দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু পুরুষ আপত্তি তুললেন, এতে নাকি তাদের মনে নানা ধরনের বাজে কল্পনা চলে আসে।

তারা নামায পড়তে আসে, অথচ তাদের মনের ভেতর এ ধরনের কদর্যতা ...! নারীদের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো কিছু প্রকাশ্যে আসলেই এ জাতীয় লোকদের 'সমস্যা' হয়ে যায়..! আমাদেরকে দমিয়ে রাখার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অজুহাতগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলে আমার ধারণা।

উপস্থিত একজন নারী:

নারীরা কথা বলা শুরু করলে মসজিদের দরজাগুলো যেন সব ভেঙ্গে পড়ে যাবে— এ ধরনের ভীতি বোধহয় তাদের মধ্যে কাজ করে। এই ভীতি দূর করতে হবে। আমাদেরকে এসব নিয়ে বলাবলি করতে হবে। মসজিদে আমাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে হবে।

আয়েশা গেসিনজার:

অন্যদের কাছে নারী-পুরুষের পৃথকীকরণের অর্থ যাই হোক না কেন, আমাদের সংস্কৃতিতে ব্যাপারটি নিছক হীনমন্যতাবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেসমিন জেইন: এবং এটি এক ধরনের জেন্ডার বৈষম্য।

আয়েশা গেসিনজার:

এই অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এক ধরনের সামাজিক চাপ রয়েছে। তবে আমি দেখছি, কিছু মানুষ এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে আসছেন। এটি খুবই ভালো লক্ষণ।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি গিয়েছিলাম **'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম উইমেনের' ডিরেক্টর আমিনা অ্যাসিলমি**র কাছে। তিনি বলেন:

"প্রকাশ্য রাস্তায় বিকিনি পরা নারী দেখে আপনার যদি সমস্যা না হয়, তাহলে মসজিদে নারীদের উপস্থিতিতেও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আপনি যদি সত্যিই নামায আদায় করতে আসেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আসেন, তাহলে তো নারীরা আপনার জন্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়। নারীদেরকে মসজিদে ঢুকতে না দেওয়া কিংবা মসজিদে পার্টিশন দেওয়া একেবারেই শিশুসুলভ আবদার। আশপাশে খেয়াল করলে দেখবেন পুরুষরা নিজেরা বলাবলি করে যে তারা আসলে খুব দুর্বল, তাই নিজেদেরকে সংবরণ করতে পারে না। এ ধরনের কথাবার্তা পুরুষদের জন্য সত্যিই অমর্যাদাকর। একজন পুরুষ কীভাবে আরেকজন পুরুষের ব্যাপারে এ ধরনের হীন চিন্তা করতে পারে! ভয়াবহ ব্যাপার!"

ইটরাথ সাঈদের সাথে আলাপচারিতা

আমি যখন ভ্যাঙ্কুভারের সানসেট বীচে পৌঁছলাম, তখন সেখানে **যুদ্ধ ও দখলদারিত্ব বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস** পালন উপলক্ষ্যে সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে। একজন ঘোষক ঘোষণা করছিলেন—

> "আজকে হয়তো এখানে ১৫ হাজার মানুষও জড়ো হননি। কিংবা, হয়তো ২০/২৫ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছেন। আপনাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের বন্ধু ও সহযোদ্ধা, ইউবিসি'র শিক্ষার্থী এবং পিএসজি'র মেম্বার ইটরাথ সাঈদ (Itrath Syed)। আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

এই ঘোষণার পর মঞ্চে আসেন **যুদ্ধবিরোধী নারী অ্যাক্টিভিস্ট ইটরাথ সাঈদ**। তিনি বক্তব্য শুরু করলেন এভাবে:

> "আমরা এখানে বলতে চাই, তারা আমাদের সাথে যে মিথ্যা কথা বলেছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। তারা আমাদেরকে বলতে চায়, দুনিয়া দুই ভাগে বিভক্ত— অসভ্য শয়তান লোকে ভর্তি প্রাচ্য এবং সভ্য ও মহান সেনাবাহিনীর পাশ্চাত্য। আমরা তাদের বানানো এই রূপকথা শুনে ঘুমিয়ে পড়তে রাজি নই। আমরা তাদের অপকর্মের সহযোগী হতে অস্বীকার করি। তারা দুনিয়াকে যে ভীতি ও ঘৃণার দেওয়ালে বিভক্ত করে রেখেছে, তা প্রত্যাখ্যান করতে আমরা এখানে জড়ো হয়েছি।..."

ইটরাত সাঈদ অমুসলিম বিশ্বে সর্বদা সোচ্চার কণ্ঠ। অথচ, নিজের সমাজে কথা বলার ক্ষেত্রে তাকে নানা অসুবিধার মুখে পড়তে হয়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রিচমন্ড শহরে অবস্থিত মসজিদুল জামি'তে বসে আমরা আলাপ করছিলাম। তিনি বলছিলেন:

> "আমার তৎপরতা মুসলিম সমাজের ভেতরে নয়, বাইরে। গত ৭/৮ বছর ধরে সহিংসতাবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত রয়েছি। একইসাথে আমি একজন নারীবাদী। আমি মুসলিম সমাজের বাইরে নারীবাদী ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করি। যে কোনো নারীবাদী মহলে আমি কথা বলতে পারি। এসব কি এক ধরনের অগ্রগতি নয়?[১]
>
> যা হোক, মূল প্রসঙ্গে আসি। আপনি যদি নামাযের জন্য আলাদা একটি কক্ষে বসেন এবং সেখান থেকে মূল জামায়াতটি দেখেন, তখন মনে হবে— আপনি এই জামায়াতের মুসল্লী নন। কারণ, আপনি সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। হ্যাঁ, আপনি সেখানে লিখিত প্রশ্ন পাঠাতে পারছেন বটে। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে যে ফল পাওয়া যায়, তার সাথে এর পার্থক্য আছে।
>
> আমার জানা মতে, এসব কারণে অনেক নারী মসজিদে খুব একটা আসেন না। কারণ, এই ধরনের পরিবেশ অস্বস্তিকর। নিজেকে কেমন যেন অপাঙক্তেয় মনে হয়। আমি মনে করি, এর পরিণতিতে নিজের কমিউনিটির সাথে এই প্রজন্মের অসংখ্য নারীর বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। তবে নিজের কমিউনিটিকে আমরা পুরোপুরি ত্যাগ

[১] সমকালীন পাশ্চাত্য বিশ্বে নারীবাদের তৃতীয় ওয়েভ চলছে, অথবা চতুর্থ ওয়েভ শুরু হয়েছে বা হচ্ছে। আমরা নারীবাদের এই ধরনের উগ্র ট্রেন্ডগুলোর বিরোধী। আমাদের দৃষ্টিতে নারীবাদের শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়েভের নিরিখে এটি সমর্থনযোগ্য। — অনুবাদ সম্পাদক

করতেও পারছি না। ফলে কমিউনিটির সাথেই আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

এই সংগ্রামের তাৎপর্য কী? কেনই বা এর প্রয়োজন দেখা দিলো? নারী এবং নারীদেহ নিয়ে আমাদের বোঝাপড়াগুলো কেমন? আমার মনে হয়, নারীদেহ এবং নারীসত্তা প্রকৃতিগতভাবেই খারাপ— এই অনুমানের ফলেই লোকেরা নারী-পুরুষের পৃথকীকরণ চায়।”

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"(হে মোহাম্মদ!) আপনি বলে দিন,
'আমার প্রতিপালক ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।
তোমরা প্রতিটি মসজিদে নিবিষ্ট মনে ইবাদত করবে
এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকবে'।"

[সূরা আরাফ: ২৯]

তাকওয়া মসজিদে

২০০০ সালের ২৪ নভেম্বর রাত আড়াইটায় ব্রিটিশ কলম্বিয়ার স্যুরে শহরে অবস্থিত তাকওয়া মসজিদে দুষ্কৃতিকারীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে মসজিদটি পুড়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে। ইতোমধ্যে মসজিদটি নতুন করে নির্মাণের কাজ চলছে।

মসজিদটির আগের স্থাপনায় নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। নতুন মসজিদে যেন নারীদেরকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, সে জন্য মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপর স্থানীয় কমিউনিটি চাপ সৃষ্টি করে। নতুন মসজিদের নকশার দায়িত্ব দেওয়া হয় **স্থপতি ও নকশাবিদ শরিফ সেনবেলে**র উপর। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা, মসজিদে নারী-পুরুষের নামাযের স্থান পৃথক থাকুক। নারীদের নামাযের কক্ষ দেখার জন্য আমি শরিফ সেনবেলের সাথে দোতলায় গিয়েছিলাম। তার সাথে আমার কথাবার্তা এখানে তুলে ধরলাম:

আমি: এখানে তাহলে নামাযের স্থানের সামনে দেয়াল দেওয়া হচ্ছে?

শরিফ সেনবেল: হ্যাঁ, তাই।

আমি: তাহলে নারীরা কীভাবে জামায়াত অনুসরণ করবে? তারা তো নিচে দেখতে পাবে না।

শরিফ সেনবেল: হ্যাঁ, নিচতলার জামায়াত দেখার কোনো ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়নি।

আমি: তাহলে নারীরা কীভাবে নামায আদায় করবে?

শরিফ সেনবেল: এ জন্য সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে। সত্যি কথা কি, দেখার ব্যবস্থা থাকার ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষ চায়নি।

আমি: ও, আচ্ছা। তারমানে এ ব্যাপারে আপনার করার কিছু ছিল না। তাই তো?

শরিফ সেনবেল: হ্যাঁ, তাই। তবে এই দেয়ালটি পুরোপুরি ইটের হবে না। অর্ধেক ইটের দেয়াল, আর বাকি অর্ধেক হবে স্বচ্ছ কাচের দেয়াল।

আমি: মানে নিচের অর্ধেক ইটের, আর উপরেরটুকু কাঁচের দেয়াল...।

শরিফ সেনবেল: উপরাংশ থেকে ছাদ পর্যন্ত স্বচ্ছ কাঁচ থাকবে।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দেন **স্যুরে শহরের বাসিন্দা রুকাইয়া মোহাম্মদ**। এতদিন মসজিদটিতে নারীদেরকে যে ঢুকতে দেওয়া হতো না, এর আগে তিনি সেই স্মৃতিচারণ করছিলেন। এখন নতুন ভবনে তাদের নামায আদায়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন।

রুকাইয়া: তারমানে আমরা খুতবা দেখতে পারবো না!

আমি: টিভি মনিটর না বসালে আপনারা নিচতলার কোনো কিছুই দেখতে পাবেন না।

রুকাইয়া: যেন বলা হচ্ছে— তোমাদেরকে জায়গা দিয়েছি, এই তো বেশি। আর কোনো কথা বলবে না। আমার কাছে এমনই মনে হচ্ছে। অবশ্য আমি অকৃতজ্ঞ নই, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

তারা নারীদের জন্য অন্তত এতটুকু হলেও ব্যবস্থা করেছে, যা তাদের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এইটুকু জায়গা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়।

আমার ধারণা, তারা নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা বিবেচনা করেনি। যদিও অনেক পুরুষ মনে করে, তারা নারীদের প্রয়োজন বুঝে। কিন্তু আসলে তারা বুঝে না।

আমি: কিন্তু আগের মসজিদটিতেও তো নারীদেরকে ঢুকতে দেওয়া হতো না।

রুকাইয়া: শুরুতে দিয়েছিলো। পরে আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। নারীরাও আর কথা বাড়ায়নি। কারণ, আমরা সাধারণত দ্বন্দ্বে জড়াতে চাই না। বিশেষত পুরুষদের সাথে। কারণ, এসব পরিস্থিতিতে পুরুষরা দৃশ্যত নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করে থাকে বলে আমার অনুমান।

তারা নারীদেরকে কেন দুর্বল মনে করে, তা আমার বুঝে আসে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা নারীদেরকে সম্মান করতে পারে না। উপরতলায় বা পুরুষদের পেছনে নামাযে দাঁড়ানোতে আমার মোটেও কোনো অসুবিধা নেই। সমাজের সদস্য হিসেবে মসজিদে নামায পড়তে পারা তো আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। তাই না? কিন্তু তারপরও সমাজের বিরূপ মনোভাবের কারণে আমি বিচ্ছিন্নবোধ করি।

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত,

“ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রা.) স্ত্রী আতিকা বিনতে যায়েদ (রা.) ফজর ও এশার নামায মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। মসজিদের কোনো কোনো মুসল্লী তাঁর কাছে একদিন জানতে চাইলো, ‘আপনি নামায পড়তে আসেন কেন? আপনি তো জানেন, ওমর (রা.) এটি পছন্দ করেন না। এতে তিনি ঈর্ষান্বিত বোধ করেন।’ তিনি জবাব দিলেন, ‘তাহলে ওমর (রা.) নিজে কেন আমাকে নিষেধ করছেন না?’ তারা বললো, ওমরকে (রা.) বাধা দেয় রাসূলের (সা.) এই কথাটি— ‘তোমরা নারীদেকে আল্লাহর ঘরে যেতে বারণ করো না।’”

[সহীহ বুখারী, নামায অধ্যায়, ৬/২; ইবনে হিব্বান, ৩২৭/১; মুয়াত্তা, ১৯৭/১; বায়হাকী, ১৯৯/৩; ইবনে খুজায়মা, ৯০/৩; ইবনে আবু শায়বা, ১৫৬/২ এবং আবু হোরায়রার সূত্রে আহমদ ৪০৫/১৫।]

আমেরিকায়

আমার সাথে যাদের কথা হয়েছে, তাদের অনেকের অভিজ্ঞতাই রুকাইয়ার মতো। তাই মুসলমানরা এই ইস্যুতে যেসব জায়গায় কথাবার্তা বলে, সেসব জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করেছি। এর অংশ হিসেবে উত্তর আমেরিকার মুসলমানরা কীভাবে জীবনযাপন করে, তা জানার জন্য আমেরিকায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে গিয়েছিলাম। এর আয়োজক ছিল 'ইসনা'।[১] প্রতিবছরই তারা এ ধরনের সম্মেলন করে থাকে। পুরো মহাদেশের মুসলমানদের একটা সম্মিলন এখানে ঘটে। তাছাড়া এটি সর্বশেষ প্রকাশিত ইসলামী বই, আর্ট, মিউজিক ও ফ্যাশন পণ্যের সবচেয়ে বড় মেলাও বটে। এই সম্মেলন হলো অল্প কয়েকটি স্থানের একটি, যেখানে নারী-পুরুষের একত্রে অংশগ্রহণকে অন্যায় হিসেবে দেখা হয় না। মসজিদে নারীদের উপযোগী পরিবেশ কীভাবে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা জানতে কয়েকজন আমেরিকান মুসলমানের সাথে কথা বলেছি। এখানে তা তুলে ধরলাম—

প্রফেসর বামবাড শাকুর আব্দুল্লাহ (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট)**:** আমেরিকান সমাজ নিজেই নারীদের উপর দমনপীড়ন ও নির্যাতকের ভূমিকায় রয়েছে।

---

[১] ISNA — Islamic Society of Northern America. এটি আমেরিকান মুসলিম সমাজের সক্রিয় সংগঠনগুলোর আমব্রেলা গ্রুপ। আমেরিকান মুসলিমদের সর্ববৃহৎ সংস্থা হিসেবে এটি পরিচিত। — অনুবাদক

ইমাম ফ্রেডরিক শাওফির আদ-দ্বীন (ওয়ার্ক পার্ক-রিভার ফরেস্ট কমিউনিটি):
নিজ পরিবারের বাইরের কোনো নারী মাত্রই আমাদের সমাজে এক ধরনের ট্যাবু। আপনারা জানেন, কোনো নারীর সাথে প্রসঙ্গক্রমেও কথাবার্তা বলা বা এ জাতীয় কিছু হলে মনে করা হয়, কোনো যৌন ব্যাপার বোধহয় এখানে ঘটছে! আস্তাগফিরুল্লাহ! আমার ধারণা, মা-বোন-খালা-স্ত্রী-কন্যা বাদে অন্যান্য নারীর সাথে একজন মুসলিম পুরুষ কী ধরনের আচরণ করবে, তা নিয়ে আমাদের সমাজের অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত।

বামবাড শাকুর আব্দুল্লাহ:
ব্যাপারটা শুধু যৌনতা সংক্রান্ত ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষিত বোনদের সাথেও অনেকে সঠিক আচরণ করতে পারেন না। একজন অশিক্ষিত পুরুষ এবং শিক্ষিত নারীর কথাই ধরুন। শিক্ষিত নারীটি অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষটির চেয়ে এগিয়ে থাকলেও মসজিদে কিন্তু পুরুষটিই কর্তৃত্ব ফলান।

প্রফেসর আমিনা বেভারলি ম্যাকক্লাউড (ডিরেক্টর, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড স্ট্যাডিজ প্রোগ্রাম, দ্যা পল ইউনিভার্সিটি):
তা ঠিক। তবে মসজিদের উপর আমার যে অধিকার, তা তাদের হাতে ছেড়ে দেবো না।

তামারিয়া আমিনা সিম্পকিন্স (গৃহবধূ):
কিন্তু বাস্তবতা হলো, আপনার এই কথার সমর্থনে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি একদম একা।

প্রফেসর আমিনা বেভারলি ম্যাকক্লাউড:
না, ব্যাপারটা আরো বড়। আমাদেরকে সমস্যার গভীরে গিয়ে

ব্যাপারটা দেখতে হবে। এ সমস্যার সমাধানে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় উদ্যোগ থাকা জরুরি। মুসলিম কমিউনিটির একটা বিরাট অংশ নিয়মিত মসজিদে যায় না। তাদেরকে মসজিদে ফিরিয়ে আনতে হবে। পরিস্থিতিকে অধিকতর অবনতির দিকে যেতে দেওয়া উচিত হবে না।

তামারিয়া আমিনা সিম্পকিন্স:
হাতাওয়ালা লম্বা পোশাক পরিধানের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন বৃহত্তর সমাজে ইসলামের নিদর্শন বয়ে বেড়াচ্ছি। এ দৃষ্টিতে বলা যায়, আমেরিকায় আমরাই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছি। এই আমাদেরকে 'আমাদের' মসজিদগুলোতে কতটুকু রেসপেক্ট করা হচ্ছে, কতটুকু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা ভেবে দেখা দরকার।

ইমাম ফ্রেডরিক শাওফির আদ-দ্বীন:
মানুষ সাধারণত একটা নির্দিষ্ট ধারায় চিন্তাভাবনা করতে অভ্যস্ত। কারো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনি নতুন নতুন মসজিদ করলেন। সেখানে জুমার নামাযের ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু জুমার খুতবা শুধু শুনেই গেলেন, বাস্তবে আমল করলেন না। এমনটা চলতে থাকলে আমাদের পক্ষে কোরআনের আলোকে সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

মাজহার আহমেদ (স্থপতি)**:**
সংগ্রাম করা ছাড়া কেউ কোনো কিছু আদায় করতে পেরেছে, এমনটা দুনিয়ার কোথাও ঘটেনি। ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। তাই আমি মনে করি, আত্মপ্রত্যয়ী প্রত্যেক নারীকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে হবে— আপনি আমাকে যত খুশি উপেক্ষা করতে পারেন, সমস্যা নেই। আমি আমার অধিকারের বিষয়ে অটল আছি।

এই প্রসঙ্গে **ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম উইমেনের ডিরেক্টর আমিনা অ্যাসলমি**কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—

> "আপনি কি মনে করেন, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানবাধিকার আদালতে মুসলিম নারীদের নালিশ করা উচিত? কোনো কোনো নারী এ ধরনের কথা বলছেন।"

তিনি জবাব দিয়েছেন,

> "ব্যাপারটা এখনো এতদূর গড়ায়নি বলে আমার ধারণা। তাছাড়া অধিকার আদায় করতে ততদূর পর্যন্ত যাওয়া লাগবেই, এমনটাও মনে করি না। কারণ, এখনকার নারীরা তো প্রাথমিক পদক্ষেপই এখন পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। মসজিদে গিয়ে তারা বলতে পারেনি, 'এখান থেকে আমি কোথাও যাবো না'।

অথচ ষাটের দশকের উদাহরণ দেখুন। নারীরা তখন গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করেছিল। তাই মাঝেমধ্যে নারীদেরকে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে হবে। এতে করে বিষয়টা নিয়ে আলোচনার পরিবেশ তৈরি হবে। নিরবে গিয়ে পুরুষদের পেছনে বসে পড়ুন। আপনার বাচ্চাকে সামনের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিন। জাস্ট চুপচাপ গিয়ে বসে পড়ুন। বিষয়টি নিয়ে লোকজনের সাথে শান্ত মেজাজ ও ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমাদের সমস্যা হলো, আমরা শুরুতেই গলার স্বর চড়িয়ে দেই। ফলে মূল কাজটা আর হয় না।"

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায়

আসরা কুররাতুল-আইন নোমানী একজন লেখক ও সাংবাদিক। মসজিদে নারীদের প্রবেশাধিকার আদায়ের জন্য তার লড়াই-সংগ্রামের ঘটনা পড়েছি। ব্যাপারটা সরেজমিনে জানার জন্য আমি ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার মরগ্যানটাউনে গিয়েছিলাম। তাদের মসজিদে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকা বা নামাযের মূল কক্ষে নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই ব্যাপারটি নিয়ে তিনি আমেরিকার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু করেন। তারপর ইস্যুটি সমাধান করতে একটি মুসলিম সংগঠন এগিয়ে আসে। ফলে আসরা সামনের দরজা দিয়ে নামাযের মূল কক্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তবে এ জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। আসরা ও তার পরিবার নিজ কমিউনিটিতে একঘরে হয়ে আছেন। তার সাথে আমার আলাপের চুম্বকাংশ তুলে ধরা হলো—

আমি: উত্তর আমেরিকায় আপনিই বোধহয় প্রথম কোনো নারী, যিনি মসজিদে মুসলিম নারীদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা হয়, সেসব নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন।

আসরা নোমানী: ২০০৪ সালে আমি এসব তৎপরতা শুরু করি। এর দুটি দিক আছে। একদিকে, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, খুব বেদনাদায়ক একটি পরিণতি আমাকে

সইতে হচ্ছে। যা হোক, তখন কাজটি না করলে আর কখন তা করা হতো?

কথা বলতে বলতে আমরা **ইসলামিক সেন্টার অব মরগ্যানটাউনের মসজিদ**টিতে ঢুকলাম।

আমি: যাই হোক, এখন তো তারা আপনাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে।

আসরা নোমানী: হ্যাঁ, দিয়েছে। আমরা দেওয়ালের পেছনে পড়ে থাকতে চাইনি। তাই এই অধিকার পেতে আমাদেরকে লড়তে হয়েছে।

আমি: তারমানে তারা চেয়েছিল, আপনারা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন?

আসরা নোমানী: জ্বি, তাই।

আমি: তারপর আপনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে 'কেয়ার'[১] এবং 'ইসনা' ব্যাপারটি সমাধান করতে এগিয়ে আসায় বর্তমান এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। তাই তো?

আসরা নোমানী: হ্যাঁ।

আমি: এই মসজিদে আপনারা ঠিক কোথায় নামায আদায় করেন?

আসরা নোমানী: এই স্থানটা (মসজিদের পেছনের কাতারগুলোর কিছু

[১] CAIR — Council on American-Islamic Relations. এটি আমেরিকান মুসলমানদের নাগরিক অধিকার নিয়ে সক্রিয় সবচেয়ে বড় সংস্থা।

অংশ) আমাদের জন্য নির্ধারিত। বলা যায়, খুতবা শোনার সময় পুরুষরা আমাদের চারপাশ জুড়েই বসে। এটা বিশাল একটা ব্যাপার। অন্তত আমার কাছে এটা চমৎকার সহাবস্থান বলেই মনে হয়।

আমি আসরার বাড়িতেও গিয়েছি। সেখানে তার মা সাজিদা নোমানীর সাথে আমার কথা হয়েছে। তারপর মরগ্যানটাউনের মসজিদে বসে আসরার ভাবী আজিমাহ নোমানীসহ তাদের সাথে আরেক দফা কথা বলেছি। কথোপকথনের চুম্বকাংশ তুলে ধরা হলো—

আসরা নোমানী: এর আগে আমার মা কখনো মসজিদে যাওয়ার সুযোগ পাননি। মসজিদ বলতে আমরা সবসময় বুঝতাম, যেখানে বাবা নামায পড়তে যান। ফলে মা কখনোই মসজিদের দরজা মাড়াননি। এই ঘটনার পর তিনি এখন আমার সাথে শুধু জুমার নামাযই নয়, অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযেও যেতে পারছেন। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযে দাঁড়াই। আমরা শুধু মা-মেয়ে বলেই এমনটা করি তা নয়। এর মাধ্যমে বরং সমাজে বাস করেও নারী হিসেবে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরি। তাই অধিকাংশ সময় তিনি আমার পাশেই দাঁড়ান।

সাজিদা নোমানী: আমি অবশ্য মসজিদে গিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নই। সেখানে গেলে আমার মনে হয় না আমি খুব শান্তিপূর্ণ জায়গায় আছি। আমি নামায পড়তে যাই বটে, কিন্তু সেখানে আমাকে মোটেও সাদরে গ্রহণ করা হয় না। কেউ কুশল বিনিময়ও করে না। এমনকি পরিচিত বন্ধুবান্ধবরাও কথা বলে না। গত ২৫ বছর ধরে তারা আমাদেরকে স্বীকার পর্যন্ত করে না। আমার জন্য এটা খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার। নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমি কী অন্যায় করেছি? কেন আমার সাথে

এমন করা হচ্ছে? আমাকে কি সেখানকার লোকেরা পাপী মনে করে?

জারকা নেওয়াজ: আসলে আপনারা তো মানুষের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন এবং সত্যিই একটি র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন করে ফেলেছেন। এর ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সম্ভবত এর চাপ সামলাতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

আজিমাহ নোমানী: ঠিক। একদম আমার মনের কথাটাই বলে দিয়েছেন।

আসরা নোমানী: আপনি কি মনে করেন, আমরা যখন ব্যালকনি থেকে কথা বলতে চাইতাম, তখন আমাদেরকে কথা বলতে না দেওয়াটা তাদের জন্য সম্মানজনক কোনো ব্যাপার ছিল? আমি মনে করি, ইসলাম আমাকে অংশগ্রহণের যে মৌলিক অধিকার দিয়েছে, এটা তার লঙ্ঘন। তারা আমাকে ব্যালকনিতে পাঠিয়ে দিতো। তারা কোনো নারীকে মাইক্রোফোনে কথা বলতে দিতো না। এমনকি ইসলাম গ্রহণের জন্য কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের বেলায়ও নয়। কারণ, তাদের ধারণায়, নারীদের কণ্ঠস্বর হলো...। এই মুহূর্তে মসজিদের ফ্লোরে বসে আমরা যা করছি, এমনকি আমরা কয়েকজন নারী যে এখানে বসে আছি, কথা বলছি— মাস ছয়েক আগেও তারা এসবকে অবৈধ মনে করতো।

আজিমাহ নোমানী: পরিবর্তন করার যে যোগ্যতা তোমার রয়েছে, আমার মতো সাধারণ মানুষের সেই যোগ্যতা ততটা নেই। এ কারণে তাদের ধ্যানধারণাগুলোর ব্যাপারে তোমার আরো সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে হলে নারী-পুরুষ উভয়েরই

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হয়। হ্যাঁ, মসজিদে নারীদের জন্য জায়গা থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেউ যদি বলতে থাকে— 'আমি যেভাবে কাজ করছি সেটাই একমাত্র সঠিক পন্থা, আমি তো বৃহত্তর স্বার্থেই কাজ করছি। তাই মন চাইলে আমার সাথে থাকেন, নয়তো রাস্তা মাপেন' এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে পরিবর্তন ততটা টেকসই হয় না।

আসরা নোমানী: আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে তারাও যেন পরিবর্তন চাইতো। তাই যদি হয়, তাহলে কেন পরির্বতনটা ২০০৪ সালে এসে হলো? অথচ আমার বয়স যখন দশ বছর, তখনই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন আমার বয়স ৩৮। গত ২৮ বছরেও কেন নামাযের মূল কক্ষে নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না? কেন এই দীর্ঘ সময় ধরে মসজিদের পরিচালনা পরিষদে একজন নারীও ছিল না? অন্য কোনো ধরনের সক্রিয় পদেও কোনো নারী ছিল না। কেন? কারণ, সবসময়ই তাদের মাঝে এ ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

জারকা নেওয়াজ: এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের সমাজের পক্ষে বেশ কঠিন। তাদের কাছ থেকে সঠিক কাজটা আদায় করার জন্য মাঝে মধ্যে তাদেরকে লজ্জায় ফেলে দিতে হবে। যদিও স্বীয় দায়িত্ববোধ থেকেই তাদের সঠিক কাজটা করা উচিত। কিন্তু নানাবিধ জটিল সমীকরণের ফলে তারা তা করছে না।

আসরা নোমানী: রোসা পার্কের আন্দোলনের ফলে যেমন কৃষ্ণাঙ্গরা বাসের যে কোনো সিটে বসার অধিকার পেয়েছিল, ঠিক তেমনি আমিও প্রচলিত নিয়মগুলোকে আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে চাই। হয়তো বছর ত্রিশের মধ্যে এমনিতেই এসব পরিবর্তন

হয়ে যাবে। তখন লোকেরা হয়তো বলাবলি করবে— জানো, একসময় কিন্তু ব্যাপারগুলো এতো সহজ ছিল না। তখন সমাজে অনেক বৈষম্য ছিল। কিন্তু আমি তো ততটা দীর্ঘ সময়ের জন্য বসে থাকতে পারবো না। ইসলাম নিয়ে আমাদের সমাজের এই ধীরগতির পরিবর্তনের জন্য দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষায় বসে থাকবে, এমন তো মনে হয় না।

তারিক সোয়াইদানের সাথে

আসরার সাথে সময় কাটানোর পর উপলব্ধি করলাম, আমাদের পক্ষে নারীদের জন্য কাঙ্খিত পরিবর্তন আনা বেশ কঠিন। যা হোক, এই পর্যায়ে **কুয়েতি স্কলার ড. তারিক সোয়াইদানে**র সাথে আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। নেতৃত্ব নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। মসজিদের পরিবেশের আরো উন্নতিসাধন দরকার বলে তিনি মনে করেন। আমার সাথে তিনি কথা শুরু করলেন এভাবে—

ড. সোয়াইদান: দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দূরদৃষ্টির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এখনকার আধুনিক সময়ে মসজিদগুলোর ব্যবস্থাপনায় বেশ দুর্বলতা রয়েছে। এই কারণে আমাদেরকে অনেক সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে মনে করি। এক সময় আমি একটি মসজিদ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছি। জুমার খুতবা দিতাম, নামাযও পড়াতাম। আমি তখন নির্দেশ দিয়েছিলাম, মসজিদে নারী-পুরুষের মাঝখানে কোনো দেয়াল রাখা যাবে না।

আমি: সেখানে কি আগে থেকেই দেয়াল ছিল?

ড. সোয়াইদান: হ্যাঁ।

আমি: দেয়ালটা দেখতে কেমন ছিল?

ড. সোয়াইদান: দেয়ালটি ছিল কাঁচের।

আমি: নারীরা কি এতদিন কাঁচের দেওয়ালের পেছনে নামায আদায়

করতো?

ড. সোয়াইদান: হ্যাঁ, নারীদের দিক থেকে কাঁচ ছিল স্বচ্ছ। ভেতরে দেখা যেত। তবে ভেতর থেকে নারীদের অংশ দেখা যেত না।

আমি: একদম আমাদের মসজিদের মতো! তারপর? আপনি কী করলেন?

ড. সোয়াইদান: আমি তাদেরকে মসজিদের ভেতরে এসে বসতে বললাম।

আমি: তারা কি ভেতরে আসার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিল?

ড. সোয়াইদান: হ্যাঁ।

আমি: এ ব্যাপারে পুরুষরা কী বললো?

ড. সোয়াইদান: কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন এই কাজের পক্ষে তাদেরকে রাসূলের (সা.) হাদীস দেখিয়েছি, সাহাবীদের উদাহরণ দিয়েছি; তখন তাদের আর বলার কিছু ছিল না। অতএব তারা...

আমি: আমি এই প্রথম শুনলাম, একজন ইমাম নারীদেরকে নামাযের মূল কক্ষের বাইরে না যেতে বলছেন!

ড. সোয়াইদান: আগে তারা ভেতরে আসতে পারতো না। অথচ তারা বাইরে বসবে, নাকি ভেতরে বসবে— এটা তো তাদের পছন্দের বিষয়। যা হোক, সেই মসজিদ থেকে চলে আসার সাত বছর পর আমি আবার মসজিদটিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, নারীরা ভেতরে বসেই আমার বক্তব্য শুনছে। কোনো পর্দা বা কাঁচের দেয়াল ছিল না।

আমি: সত্যিই দারুণ উৎসাহব্যঞ্জক একটা ঘটনা শুনলাম।

ম্যানিটোবার ক্যাম্পিংয়ে

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন— নারীরা মসজিদের কোথায় নামায আদায় করবে, এটা তো সহজ একটা ব্যাপার। এতে জটিলতার কী আছে? তবে বাস্তবতা ভিন্ন। তাই আগে সমাজের বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

উইনিপেগের মুসলমানরা বাচ্চাকাচ্চাসহ সময় কাটানোর জন্য প্রতিবছরই একটি ক্যাম্পের আয়োজন করে। এবার ক্যাম্প করা হয়েছে ম্যানিটোবার গিমলিতে। সেখানে এ বিষয়ে আমি একটি আলোচনার আয়োজন করি। আলোচনার প্যানেল সদস্য ছিলেন **ম্যানিটোবা ইসলামিক এসোসিয়েশনের ইমাম হোসনী আজ্জাবী** এবং **আমার বান্ধবী নাদিরা ও আমাল আবু কারাম** (এই দুজন একসময় উইনিপেগে বাস করতেন)। মসজিদে নারীদের নামাযের স্থানের সামনে দেয়াল থাকার ব্যাপারে সৃষ্ট হতাশার বিষয়টি পুরুষদেরকে কীভাবে বুঝাবো, তা নিয়ে আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। আলোচনার মূল অংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

> **জারকা নেওয়াজ:** আপনারা জানেন, নারীরা কোথায় নামায আদায় করবে, তা এখন একটা বিশাল ইস্যু। তারচেয়েও বড় কথা হলো, নারীদেরকে কি দেখা যাবে? তাদের কণ্ঠস্বর কি শোনা যাবে? আমি পুরো দেশজুড়ে মুসলিম নারীদের সাথে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলছি। তারা আমাকে বলেছে, মুসলিম নারীদের পক্ষে সমাজে নিজেদের মতামত দিতে পারা খুবই কঠিন কাজ। যা হোক, মসজিদে

দেয়াল থাকার নেতিবাচক ফলাফল কী হতে পারে? এ ব্যাপারে আপনাদের ব্যক্তিগত অভিমত শুনতে চাই।

আমাল আবু কারাম: ঠিক আছে, শুরু করা যেতে পারে। আমি তো এখন আর এখানে থাকি না... (হাসি)।

জারকা নেওয়াজ: সেজন্যই তোমাকে প্যানেলে রাখা হয়েছে।

আমাল আবু কারাম: আমি মনে করি, দেয়াল থাকলে নারী ও শিশুরা মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে কমিউনিটির উন্নতি ঘটবে না। এটা একটা উদাহরণ মাত্র। সমাজের কর্মকাণ্ডের উপর এর প্রভাব রয়েছে। আমি ঠিক জানি না, এখানকার কমিউনিটি এখন কতটা সক্রিয়। তবে নারীরা যদি মসজিদে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করে, তাহলে সেটা নিশ্চয় চিন্তার বিষয়।

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি: আমি মনে করি, মুসলমানদের জন্য এসব ইস্যু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটা অনৈসলামিক পরিবেশের মধ্যে আমরা রয়েছি। এখানে আমাদের অনুসৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে অমুসলিমরা সাধারণত এসব ইস্যু নিয়ে এই পন্থায় বিতর্ক তৈরি করে।

একজন কমিউনিটি মেম্বার: দেখা যাচ্ছে, অনেক কিছুতেই এক ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। নারীদেরকে সবসময় পুরুষের সমকক্ষ ও পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের মসজিদ ও কমিউনিটিতে এই প্রবণতা লক্ষ করছি। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যেন নিত্য নতুন সব বিষয় নিয়ে নারীদেরকে তর্ক-বিতর্ক করতেই হবে।

আমরা নারীদেরকে আমাদের সমাজে অগ্রাহ্য করছি না। সব ব্যাপারেই তারা তাদের মতামত দেবেন, এটা আমরা চাই। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ঘরই হলো নারীদের জন্য সঠিক স্থান।

ডিয়ানা ডিসান্টিজের প্রতিউত্তর: আমি নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিশ্বাসী। নারীদেরকে নিজেদের কমিউনিটির অংশ হয়ে ওঠার চেষ্টা করা উচিত...।

কমিউনিটি মেম্বারের জবাব: আমি ঠিক এ কথাই বলেছি। আপনার বক্তব্য মোটেও অগ্রাহ্য করছি না। আমি শুধু বলেছি, প্রত্যেকেই ছাড় দিতে চায়, আমরাও চাই। তাই আরো বেশি করে জানার চেষ্টা করুন, তাহলে আরো ছাড় দিতে শিখবেন। এ কথাটাই আমি বলেছি।

ডিয়ানা ডিসান্টিজের প্রতিউত্তর: আমি বিশ্বাস করি, নারীরা যেমন সন্তান লালন-পালন করতে পারে, তেমনি একটি দেশও গড়ে তুলতে পারে। তাই নারীদের কথা শোনা উচিত। নারীরা ঘরে আবদ্ধ থাকলে, তাদের কথা না শোনা হলে দুনিয়া কীভাবে টিকবে? আল্লাহ তায়ালাও তাই শুধু পুরুষ সৃষ্টি করেননি, নারীদেরও সৃষ্টি করেছেন।

কমিউনিটি মেম্বারের জবাব: স্বামী-সন্তানের যত্ন নেওয়া, পরিবার দেখাশোনা করা নারীদেরই কাজ। আমি দৃঢ়ভাবে এটি বিশ্বাস করি।

ইমাম হোসনী আব্জাবী: মসজিদে পার্টিশন থাকাকে আমি বড় কোনো ইস্যু মনে করি না। কারণ, এটি ইসলামের অপরিহার্য অংশ নয়। এমনকি নামাযের ফরজ-ওয়াজিবের মধ্যেও এটি পড়ে

না। এ বিষয়ে লোকেরা নানা ধরনের মতামত দিতেই পারে। তবে কাউকে না কাউকে রোল মডেল হিসেবে অনুসরণ করা উচিত।

আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রোল মডেল হিসেবে আমরা কাকে মানবো। উদাহরণ হিসেবে আমরা মহানবীর (সা.) স্ত্রীদের কথা বলতে পারি। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রোল মডেল হিসেবে মেনে চলার উপদেশ দিয়েছেন। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন ঘরেই অবস্থান করে। সুতরাং...।

সংস্কৃতি বনাম ধর্ম

নারীদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘরে আবদ্ধ রাখার এই প্রচলিত ধ্যানধারণা কি আদৌ ইসলামসম্মত? নাকি ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলেই এসব ধারণার ভিত্তি তৈরি হয়েছে? বিষয়টি নিয়ে আমি বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলেছি। প্রথমে কুয়েতি স্কলার **ড. তারিক সোয়াইদানে**র বক্তব্য তুলে ধরলাম—

> "দুঃখজনকভাবে মুসলিম বিশ্বে ইসলামের মূলনীতির পরিবর্তে স্থানীয় প্রথাগুলোই গেড়ে বসে আছে। বেশিরভাগ মানুষ মহানবীর (সা.) শিক্ষা থেকে এসব প্রথাকে আলাদা করতে পারে না। মহানবীর (সা.) সময়কালকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা স্পষ্টতই দেখবো, নারী-পুরুষকে আলাদা করার জন্য সেখানে কোনো দেয়াল বা পর্দা ছিল না। শুধু মহানবীর (সা.) স্ত্রীগণ ছিলেন এর ব্যতিক্রম।[১] এর কারণ হলো তারা হলেন মুসলমানদের কাছে মায়ের মতো। তাই পবিত্র দৃষ্টি ছাড়া তাদের দিকে কারো তাকানো ছিল অনুচিত।

---

[১] হে নবীপত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মতো (সাধারণ নারী) নও, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে (অন্য পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না, (যদি এমন করো) তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে, (তবে) তোমরা (সর্বদাই) ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে। (সূরা আহযাব: ৩২)

এই কারণেই তারা ছিলেন ব্যতিক্রম। দুঃখজনকভাবে অনেক স্কলার এবং পরবর্তীতে সাধারণ মানুষও ব্যাপারটি মুসলিম নারীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আরেকটা আয়াতে বলা হয়েছে, পর্দার আড়াল ছাড়া তাদের সাথে কথা বলা উচিত নয়।[২] আপনি যদি ভালোভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন করেন (আমি তা করেছি), ভালোভাবে কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করেন, তাহলে স্পষ্টতই বুঝতে পারবেন, এই ব্যাপারটি শুধু উম্মুল মুমিনীনদের তথা মহানবীর (সা.) স্ত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যদের বেলায় নয়।"

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম উইমেনের ডিরেক্টর আমিনা অ্যাসিলমিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নারীদেরকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যাপারে মুসলিম পুরুষদের দৃশ্যমান এই অতি কঠোরতার কারণ কী বলে মনে করেন? জবাবে তিনি বলেছেন—

"অজ্ঞতা এবং স্থানীয় সংস্কৃতির অনুসরণই হলো এর মূল কারণ। অমুক শায়খ, তমুক হুজুর কিংবা মা-বাবা— এভাবে নানা জনের কাছ থেকে নারীদের ব্যাপারে এভাবে শুনে শুনে লোকেরা বড় হয়েছে। কোনো কোনো দেশে নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার বিষয়টি সামাজিক প্রথা হিসেবে প্রচলিত। এ দেশেও তারা সেগুলো নিয়ে এসেছেন। এটি নিছকই অজ্ঞতা। গভীরভাবে কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করলে তারা বুঝতে পারবেন, তাদের ধারণা সঠিক

[২] তোমাদের যদি নবীপত্নীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিয়ো, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার জন্য অধিকতর উপযোগী। (সূরা আহযাব: ৫৩)

নয়। মুসলিম দেশগুলোতে কোনো কিছুর প্রচলন থাকলেই তা ইসলামসম্মত, এমন কোনো কথা নেই।"

একই প্রশ্নের জবাবে **নববী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. ওমর ফারুক আব্দুল্লাহ** বলেছেন—

"আপনি যে প্রসঙ্গটি তুলেছেন, তা মূলত একটি অধঃপতিত সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতিকেও এটি অধঃপতিত করেছে। এটি মূলত এসেছে ভারত, পাকিস্তান বা আরব অঞ্চল থেকে। এটি আসলে ইসলামী সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ নয়।"

দুনিয়ার যে কোনো সংস্কৃতি বা ধর্মকেই অধঃপতনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। মুসলমানরা নিজেরাই ধর্মীয় সাহিত্যে যেসব পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ঢুকিয়েছে, সেগুলো দূর করাই এখন মুসলমানদের জন্য চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে **হাদীসশাস্ত্রবিদ ও ফকীহ শায়খ আব্দুল্লাহ আজমী**র বক্তব্য হলো—

"আমাদের সমাজে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে, যেখানে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। নিজেদের গড়ে তোলা এই অজ্ঞতাসুলভ বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে আমরা এখন ফতোয়া দিচ্ছি। তারপর একেই ইসলামের আইনগত অবস্থান বলে দাবি করছি! তাই না?"

নারীদের নিয়ে পুরুষদের লেখা কিছু বই দেখলে অবাক লাগে। মনে হয় যেন নারীদের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণকে ন্যায্যতা দিতেই তারা ইসলামী জ্ঞানের উৎসদ্বয়কে (কোরআন ও হাদীস) কাটাছেঁড়া করেছেন। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরো দুনিয়ার মুসলিম সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে নারীদেরকে সামাজিক কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যাপারটি গেড়ে

বসেছে। শায়খ আজমীর শেষ কথা হলো—

> "আমি মনে করি, নারীদেরকে সামাজিক কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার স্ববিরোধ থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত। যেহেতু বাস্তবেই আমাদের একত্রে কাজ করার গঠনমূলক উদ্দেশ্য রয়েছে। কোরআনে নারী-পুরুষকে সমন্বিতভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, বিশ্ব পরিচালনার ব্যাপারে তারা সমভাবে দায়বদ্ধ।"

ড. তারিক সোয়াইদান এ ব্যাপারে আমার কাছে বলেছেন—

> "আমি মনে করি, যারা মসজিদে দেয়াল, পর্দা বা এ জাতীয় কিছু আরোপ করতে চায়, তাদের নিয়ত ভালো। নামাযের স্থানে যেন বাজে কিছু না ঘটে, মুসল্লীদের মনে যাতে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য তৈরি না হয়, পবিত্র মনে যেন নামায আদায় করা যায়— এ ব্যাপারগুলো তারা নিশ্চিত করতে চান। আমি তাদের এই নিয়তকে সম্মান করি, যদিও তাদের কর্মপদ্ধতি ভুল। আসলে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই এমনটা হচ্ছে। আপনি দেখবেন, অনেকেই একে সঠিক মনে করে। কিন্তু তাদেরকে যখন প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝাবেন, তখন তারা ঠিকই বুঝতে পারবে।"

পরিবর্তনের সূচনা

এরমধ্যে এক বছর পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পর রেজিনায় আমার মসজিদটিতে আবার গেলাম। ততদিনে সেখানে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। চলতি বছর আমাদের **ইসলামিক এসোসিয়েশন অব রেজিনা**র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন **ড. আহমদ আবু শীর**। এই ধরনের দায়িত্বে তিনি নতুন। তিনি মসজিদের পরিবেশ উন্নয়ন করার দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এই নতুন পরিস্থিতিতে নারীরা এখন মসজিদে আগের চেয়ে বেশি সক্রিয়। কমিউনিটির বিভিন্ন কমিটিতে পুরুষদের পাশাপাশি আমার বান্ধবীরাও এখন মনোনীত হচ্ছে। মসজিদে ঢুকতেই ড. আহমদের সাথে দেখা হয়ে গেলো। আমরা সালাম ও কুশল বিনিময় করলাম। তারপর তার অফিসে গিয়ে বসলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, আমাদের কমিউনিটির সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যাপারে আপনি কী ভাবছেন? আমরা কীভাবে সংস্কার কাজ শুরু করতে পারি?

তিনি জবাব দিয়েছেন,

> "সবাই একটা ইতিবাচক পরিবর্তন চাচ্ছে, যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, মিলেমিশে থাকতে পারি। তাই কমিউনিটির সবাই যেন সন্তুষ্ট থাকে তা বিবেচনায় রেখে আমরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন নিয়মকানুনের প্রচলন ঘটাতে পারি। কোনো সমস্যা আলোচনার টেবিলে উত্থাপন করাই হলো সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। এতে আমি-

আপনি-সবাই সমস্যাটির দিকে নজর দিতে পারবো। সমাধানের জন্য আমাদের হাতে রয়েছে দুটি মানদণ্ড— কোরআন ও হাদীস। এভাবে আমরা আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবো। আমি মনে করি, এর ফলে নিকট ভবিষ্যতেও তেমন কোনো সমস্যা তৈরি হবে না।"

যদিও আমি আশাবাদী, তারপরও এই পরিবর্তনের স্থায়িত্ব নিয়ে একটা শংকা কাজ করে। কারণ, এখানে মাত্র একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে যিনি নতুন প্রেসিডেন্ট হবেন, মসজিদে নারীদের নামাযের স্থানের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমও হতে পারে। যা হোক, তারা কাঁচের দেয়াল দেওয়ার পর থেকে আমি এখানে আর জুমার নামায আদায় করিনি। তারপর এই প্রথম জুমার নামায পড়তে এসেছি। তাই নামায শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে যেতে আমি কিছুটা নার্ভাস ফিল করেছি।

আমি মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে ভালোবাসি। অথচ আমাকে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল। এতে আমি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমার কাছে মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের কেন্দ্র। আমি যেমন একটা আনন্দময় পরিবেশে মুসলিম হিসেবে বেড়ে ওঠেছি, আমি চাই আমার বাচ্চারা, বিশেষ করে আমার মেয়েরা যেন ঠিক সেই অনুভূতি নিয়েই বেড়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।
(সূরা রাদ: ১১)